

চিরায়ত

কপালকুণ্ডলা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



KOBIPROKASHANI

কপালকুণ্ডলা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকাল

কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রকাশক

সঞ্জল আহমেদ

কবি প্রকাশনী

৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট

২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সব্যসাচী হাজারা

নান্দীমুখ

শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাকী

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস

৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক

অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ২৩০ টাকা

Kopalkundala a novel by Bankim Chandra Chatterjee

Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Katabon Dhaka 1205

Kobi Prokashani First Edition: February 2026

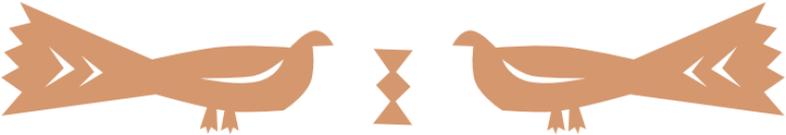
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)

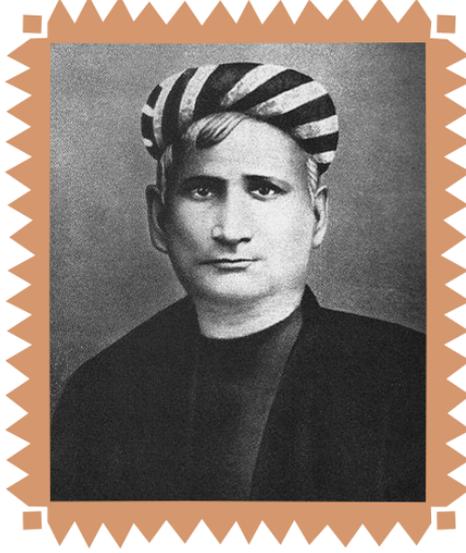
Price BDT 230 RS 230 US\$ 15

E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-29364-2-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ডিজিট করুন
www.kobibd.com অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১





বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অদ্ভুতকর্মা এক মানুষ। বাংলার প্রথম 'আধুনিক' পুরুষ। তাঁর রচনা ও ভাবনার প্রভাব বাঙালির মননে ও মস্তিষ্কে আজও প্রবল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানুষ একজন, কিন্তু ছিল বহুমুখী পরিচয়। প্রথম সার্থক আধুনিক বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা, সাহিত্য সম্রাট, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক। প্রথম বাঙালি গ্র্যাজুয়েটদের অন্যতম এবং শ্রীমন্তগবদগীতার অনন্য ভাষ্যকার 'ঋষি' বঙ্কিমের জন্ম ১৮৩৮ সালের ২৭ জুন উত্তর চব্বিশ পরগনার কাঁঠালপাড়ায়। জীবিকায় ব্রিটিশ রাজের খেতাবী, পদস্থ কর্মকর্তা। কিন্তু প্রশাসনের কঠিন চৌকাঠ ডিঙিয়ে তাঁর সত্য পরিচয় গড়ে উঠেছিল কলমের ডগায়। ১৮৯৪ সালে প্রয়াণের শতবর্ষ পেরিয়ে আজও তর্কে-বিতর্কে প্রাসঙ্গিক! রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছিলেন—'বঙ্কিমই বঙ্গভাষাকে বাল্যকাল হইতে যৌবনে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।'



কপালকুণ্ডলা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : সাগরসঙ্গমে

“Floating straight obedient to the stream.”

Comedy of Errors.

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্তুগিস ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝাটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিগ্ধনিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহীগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবা পুরুষ, এই দুই জন মাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্তা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাঝি, আজ কত দূর যেতে পারবি?” মাঝি কিছু ইতস্তত করিয়া বলিল, “বলিতে পারিলাম না।”

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, “মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।”

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, “ব্যস্ত হব না? বল কি, বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সম্বৎসর খাবে কি?”

এ সংবাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে পশ্চাদগত অন্য যাত্রীর মুখে পাইয়াছিলেন। যুবা কহিলেন, “আমি ত পূর্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটাতে অভিভাবক আর কেহ নাই—মহাশয়ের আসা ভাল হয় নাই।”

প্রাচীন পূর্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, “আসব না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম করিব না ত কবে করিব?”

যুবা কহিলেন, “যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটা বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।”

বৃদ্ধ কহিলেন, “তবে তুমি এলে কেন?”

যুবা উত্তর করিলেন, “আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেইজন্যই আসিয়াছি।” পরে অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে কহিতে লাগিলেন, “আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।

“দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তথী

তমালতালীবনরাজিনীলা।

আভাতি বেলা লবণাসুরাশে—

ধীরানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥”

বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না। নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহাই একতানমনা হইয়া শুনিতেন।

একজন নাবিক অপরকে কহিতেছিল, “ও ভাই—এ ত বড় কাজটা খারাবি হলো—এখন কি বার-দরিয়ায় পড়লেম—কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝিতে পারি না।”

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ বুঝিলেন যে কোন বিপদ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাঝি কি হয়েছে?” মাঝি উত্তর করিল না। কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দিক

অতি গাঢ় কুজ্বাটিকায় ব্যাণ্ড হইয়াছে; আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল, কোন দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন, নাবিকদের দিগ্ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না— পাছে বাহির-সমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিমনিবারণ জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু নব্য যাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন; তখন নৌকামধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়েকটি স্ত্রীলোক নৌকামধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আত্ননাদ করিয়া উঠিল। প্রাচীন কহিল, “কেনারায় পড়! কেনারায় পড়! কেনারায় পড়!”

নব্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “কেনারা কোথা, তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ হইবে কেন?”

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নব্য যাত্রী কোনমতে তাহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিকদিগকে কহিলেন, “আশঙ্কার বিষয় কিছু নাই, প্রভাত হইয়াছে—চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্যোদয় হইবে। চারি পাচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, শ্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক; পশ্চাৎ রৌদ্ৰ হইলে পরামর্শ করা যাইবে।”

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেক্ষণ পর্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ। বেশী বাতাস নাই। সুতরাং তাহারা তরঙ্গান্দোলনকম্প বড় জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাংম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,— সেই কেবল কাঁদিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমত সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচ পীরের নাম কীর্তিত করিয়া মহাকোলাহল করিয়া উঠিল। যাত্রীরা সকলেই জিহ্বাসা করিয়া উঠিল, “কি!

কি! মাঝি, কি হইয়াছে?” মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, “রোদ উঠেছে! রোদ উঠেছে! ঐ দেখ ডাঙ্গা!” যাত্রীরা সকলেই ঔসুক্যসহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সূর্যপ্রকাশ হইয়াছে। কজ্জ্বটিকার অন্ধকাররাশি হইতে দিঙমণ্ডল একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে। বেলা প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্তী বটে,—এমন কি, পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কুলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকেই দেখা যায় অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশিমালাপ্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগনসহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল, সচরাচর সকর্দম নদীজলবর্ণ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ। আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন; তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌতপ্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলে দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ সৈকতভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষীগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে “রসুলপুরের নদী” নাম ধারণ করিয়াছে।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উপকূলে

“Ingratitude! Thou marble-hearted fiend!”

King Lear.

আরোহীদিগের স্মৃতিব্যঞ্জক কথা সমাপ্ত হইলে, নাবিকেরা প্রস্তাব করিল যে, জোয়ারের বিলম্ব আছে;—এই অবকাশে আরোহীগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে পারিবেন। আরোহীবর্গও এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন। তখন

নাবিকেরা তরি তীরলগ্ন করিলে আরোহীগণ অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাদির পর পাকের উদ্যোগে আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল—নৌকায় পাকের কাষ্ঠ নাই। ব্যাঘ্রভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন, প্রাপ্ত যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বাপু নবকুমার! তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই।”

নবকুমার কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “আচ্ছা যাইব; কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া একজন আমার সঙ্গে আইস।”

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না।

“খাবার সময় বুঝা যাবে” এই বলিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকী কুঠার হস্তে কাষ্ঠাহরণে চলিলেন।

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই। কেবল বন মাত্র। কিন্তু সে বন, দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে;—কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াছে। নবকুমার তন্মধ্যে আহরণযোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধান নদীতট হইতে অর্ধেক দূর গমন করিতে হইল। পরিশেষে ছেদনযোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল। নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ সকল কর্মে অভ্যাস ছিল না; সম্যক বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভার বহন বড় ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক, যে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অগ্নে ক্লান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না, এজন্য তিনি কোনমতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন। কিয়দূর বহেন, পরে ক্ষণেক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন; এইরূপে আসিতে লাগিলেন।

এই হেতুবশত নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সমভিব্যাহারীগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্ভিগ্ন হইতে লাগিল; তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। সম্ভাব্য কাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হইল। অথচ

কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে।

নৌকারোহীগণ এইরূপে কল্পনা করিতেছিল, ইত্যবসরে জলরাশিমধ্যে ভৈরব কল্লোল উথিত হইল। নাবিকেরা বুঝিল যে, জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এ সকল স্থানে জলোচ্ছ্বাসকালে তটদেশে এরূপ প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি তীরবর্তী থাকিলে তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এজন্য তাহারা অতিব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদী-মধ্যবর্তী হইতে লাগিল। নৌকা মুক্ত হইতে না হইতে সম্মুখস্থ সৈকতভূমি জলপ্লাবিত হইয়া গেল, যাত্রীগণ কেবল ত্রস্তে নৌকায় উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, তঞ্জলাদি যাহা যাহা চরে স্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় ভাসিয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশত নাবিকেরা সুনিপুণ নহে; নৌকা সামলাইতে পারিল না; প্রবল জলপ্রবাহবেগে তরণী রসুলপুর নদীর মধ্যে লইয়া চলিল। একজন আরোহী কহিল, “নবকুমার রহিল যে?” একজন নাবিক কহিল, “আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।”

জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে, প্রত্যাগমন করিতে কিন্তু ক্লেশ হইবে, এইজন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমনকি, সেই মাঘ মাসে তাহাদিগের ললাটে স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল। এইরূপ পরিশ্রম দ্বারা রসুলপুর নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু নৌকা যেমন বাহিরে আসিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে উত্তরমুখী হইয়া তীরবৎ বেগে চলিল, নাবিকেরা তাহার তিলার্ধ মাত্র সংযম করিতে পারিল না। নৌকা আর ফিরিল না।

যখন জলবেগ এমত মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্তন করা যাইবে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যিক হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যিক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশী মাত্র, কেহই আত্মবন্ধু নহে। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করা আর এক ভাঁটার কর্ম। পরে রাত্রি আগত হইবে, আর রাত্রে নৌকা চালনা হইতে পারিবে না, অতএব পর দিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এ কাল পর্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে। দুই দিন নিরাহারে সকলের প্রাণ

ওষ্ঠাগত হইবেক। বিশেষ নাবিকরা প্রতিগমন করিতে ‘অসম্মত’; তাহারা কথার বাধ্য নহে। তাহারা বলিতেছে যে, নবকুমারকে ব্যাশ্বে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্লেশ-স্বীকার কি জন্য?

এরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা তাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যত বার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বীর পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?



তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বিজনে

“—Like a veil,
Which if withdrawn, would but disclose the frown
Of one who hates us, so the night was shown
And grimly darkled, o’er their faces pale
And hopeless eyes.”

Don Juan

যে স্থানে নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া যাত্রীরা চলিয়া যান, তাহার অনতিদূরে দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুই ক্ষুদ্র গ্রাম এক্ষণে দৃষ্ট হয়। পরন্তু যে সময়ের বর্ণনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ে তথায় মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন ছিল না; অরণ্যময় মাত্র। কিন্তু বাঙ্গলাদেশের অন্যত্র ভূমি যেরূপ সচরাচর অনুদ্ঘাতিনী, এ প্রদেশে সেরূপ নহে। রসুলপুরের মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত অবাধে কয়েক যোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক বালুকাস্তপশ্রেণী বিরাজিত আছে। আর কিছু উচ্চ হইলে ঐ বালুকাস্তপশ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী বলা যাইতে পারিত। এক্ষণে লোকে উহাকে

বালিয়াড়ি বলে। ঐ সকল বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা মধ্যাহ্নসূর্যকিরণে দূর হইতে অপূর্ব প্রভাবিশিষ্ট দেখায়। উহার উপর উচ্চ বৃক্ষ জন্মে না। স্তূপতলে সামান্য ক্ষুদ্র বন জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যদেশে বা শিরোভাগে প্রায়ই ছায়াশূন্য ধবলশোভা বিরাজ করিতে থাকে। অধোভাগমণ্ডনকারী বৃক্ষাদির মধ্যে, ঝাটী, বনঝাউ এবং বনপুষ্পই অধিক।

এইরূপ অপ্রফুল্লকর স্থানে নবকুমার সঙ্গীগণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কাষ্ঠভার লইয়া নদীতীরে আসিয়া নৌকা দেখিলেন না; তখন তাঁহার অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু সঙ্গীগণ যে তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এমত বোধ হইল না। বিবেচনা করিলেন, জলোচ্ছ্বাসে সৈকতভূমি প্লাবিত হওয়ায় তাঁহারা নিকটস্থ অন্য কোন স্থানে নৌকা রক্ষা করিয়াছেন, শীঘ্র তাঁহাকে সন্ধান করিয়া লইবেন। এই প্রত্যাশায় কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু নৌকা আইল না। নৌকারোহীও কেহ দেখা দিল না। নবকুমার ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। আর প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া, নৌকার সন্ধান নদীর তীরে তীরে ফিরিতে লাগিলেন। কোথাও নৌকার সন্ধান পাইলেন না, প্রত্যাবর্তন করিয়া পূর্বস্থানে আসিলেন। তখন পর্যন্ত নৌকা না দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, জোয়ারের বেগে নৌকা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে; এখন প্রতিকূল শ্রোতে প্রত্যাগমন করিতে সঙ্গীদিগের কাজে কাজেই বিলম্ব হইতেছে। কিন্তু জোয়ারও শেষ হইল। তখন ভাবিলেন, প্রতিকূল শ্রোতের বেগাধিক্যবশত জোয়ারে নৌকা ফিরিয়া আসিতে পারে নাই; এক্ষণে ভাঁটায় অবশ্য ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভাঁটায় ক্রমে অধিক হইল—ক্রমে ক্রমে বেলাবসান হইয়া আসিল; সূর্যাস্ত হইল। যদি নৌকা ফিরিয়া আসিবার হইত, তবে এতক্ষণ ফিরিয়া আসিত।

তখন নবকুমারের প্রতীতি হইল যে, হয় জলোচ্ছ্বাসসম্ভূত তরঙ্গে নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, নচেৎ সঙ্গীগণ তাঁহাকে এই বিজনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

নবকুমার দেখিলেন যে, গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহাৰ্য নাই, পেয় নাই; নদীর জল অসহ্য লবণাত্মক; অথচ ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। দুরন্ত শীতনিবারণজন্য আশ্রয় নাই, গাত্রবস্ত্র নাই। এই তুষার-শীতল-বায়ু-সঞ্চারিত-নদী-তীরে, হিমবর্ষী আকাশতলে, নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবেক। রাত্রিমধ্যে ব্যাস্ত্র ভল্লুকের সাক্ষাৎ পাইবার সম্ভাবনা। প্রাণনাশই নিশ্চিত।

মনের চাঞ্চল্যহেতু নবকুমার এক স্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তীর ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলেন। ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্বত্র জনহীন,—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব। তথাপি নবকুমার সেই অন্ধকারে, হিমবর্ষী আকাশতলে বালুকাস্তূপের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখনও উপত্যকায়, কখনও অধিত্যকায়, কখনও স্তূপতলে, কখনও স্তূপশিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে প্রতি পদে হিংস্র পশু কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এক স্থানে বসিয়া থাকিলেও সেই আশঙ্কা।

ভ্রমণ করিতে করিতে নবকুমারের শ্রম জন্মিল। সমস্ত দিন অনাহার; এজন্য অধিক অবসন্ন হইলেন। এক স্থানে বালিয়াড়ির পার্শ্বে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া বসিলেন। গৃহের সুখতপ্ত শয্যা মনে পড়িল। যখন শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের অবসাদে চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন কখনও কখনও নিদ্রা আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়। নবকুমার চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইলেন। বোধ হয় যদি এরূপ নিয়ম না থাকিত, তবে সাংসারিক ক্লেশের অপ্রতিহত বেগ সকলে সকল সময়ে সহ্য করিতে পারিত না।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ : স্তূপশিখরে

“—সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে,
ভীষণ-দর্শন-মূর্তি।”

মেঘনাদবধ

যখন নবকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রজনী গভীরা। এখনও যে তাঁহাকে ব্যাঘ্রে হত্যা করে নাই, ইহা তাঁহার আশ্চর্য বোধ হইল। ইতস্তত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র আসিতেছে কি না। অকস্মাৎ সম্মুখে,

বহুদূরে, একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। পাছে ভ্রম জন্মিয়া থাকে, এজন্য নবকুমার মনোভিন্বেশপূর্বক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আলোকপরিধি ক্রমে বর্ধিতায়তন এবং উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল—আগ্নেয় আলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মাইল। প্রতীতিমাত্র নবকুমারের জীবনশা পুনরুদীপ্ত হইল। মনুষ্যসমাগম ব্যতীত এ আলোকের উৎপত্তি সম্ভবে না, কেন না, এ দাবানলের সময় নহে। নবকুমার গাত্রোথান করিলেন। যথায় আলোক, সেই দিকে ধাবিত হইলেন। একবার মনে ভাবিলেন, “এ আলোক ভৌতিক?—হইতেও পারে; কিন্তু শঙ্কায় নিরস্ত থাকিলেই কোন্ জীবন রক্ষা হয়?” এই ভাবিয়া নিভীকচিত্তে আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। বৃক্ষ, লতা, বালুকাস্তূপ পদে পদে তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল। বৃক্ষলতা, দলিত করিয়া, বালুকাস্তূপ লঙ্ঘিত করিয়া নবকুমার চলিলেন। আলোকের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন যে, এক অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের শিরোভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে, তৎপ্রভায় শিখরাসীন মনুষ্যমূর্তি আকাশপটস্থ চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। নবকুমার শিখরাসীন মনুষ্যের সমীপবর্তী হইবেন স্থির সঙ্কল্প করিয়া, অশিথিলীকৃত বেগে চলিলেন। পরিশেষে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। তখন কিঞ্চিৎ শঙ্কা হইতে লাগিল—তথাপি অকম্পিতপদে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। আসীন ব্যক্তির সম্মুখবর্তী হইয়া যাহা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিষ্ঠিবেন কি প্রত্যাবর্তন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

শিখরাসীন মনুষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল—নবকুমারকে প্রথমে দেখিতে পাইল না। নবকুমার দেখিলেন, তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কি না, তাহা লক্ষ্য হইল না; কটিদেশ হইতে জানু পর্যন্ত শার্দূলচর্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শাশ্রুজটাপরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল—সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া নবকুমার সে স্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার একটা বিকট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন; ইহার আসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভূত করিতে পারিলেন। জটাদারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে, তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রব পদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি,